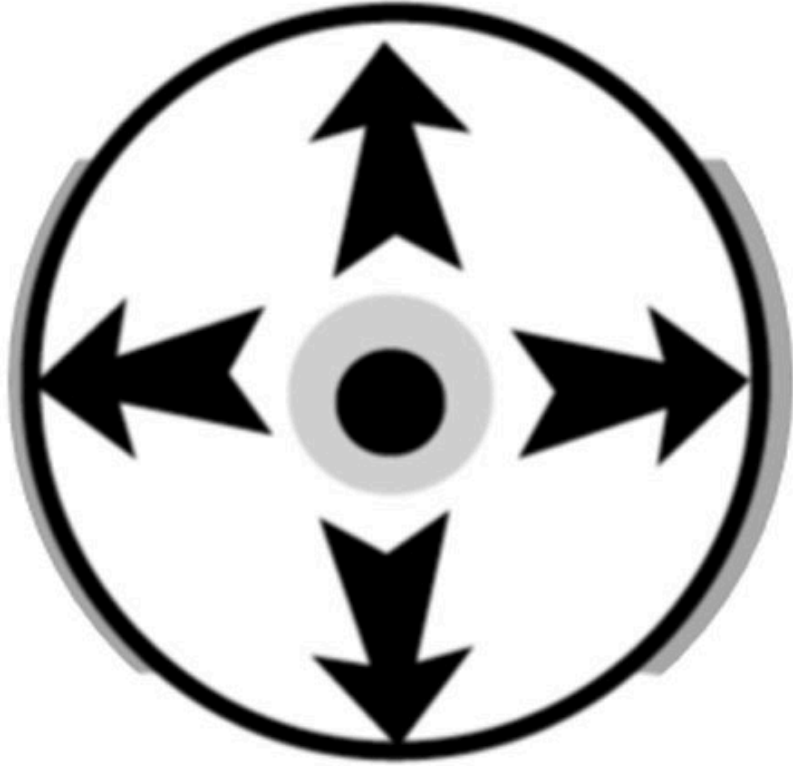


বিদ্যালয়হীন ১২ গ্রামে বিবর্ণ শৈশব



রীমা ইসলাম

প্রকাশ: ১১ জুলাই ২০২৬ | ০৭:২৩

| প্রিন্ট সংস্করণ



দেশের উন্নয়নের গল্পে শিক্ষা অন্যতম বিষয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, পাঠ্যবই উৎসব, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং কিংবা ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা-সবকিছু মিলিয়ে রাষ্ট্র বারবার বলেছে, কোনো শিশুই শিক্ষার বাইরে থাকবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরের ১২টি গ্রামের বাস্তবতা সেই জাতীয় সাফল্যের গল্পকে কঠিন এক প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। বুধবার সমকালে ‘হাতে উঠছে না কলম, স্কুলে পড়ছে না পা’ শিরোনামে এ বিষয়টি নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে ১২ গ্রামের শিশুর হাতে কলমের বদলে ধানের আঁটি, বইয়ের ব্যাগের বদলে শ্রমের বোঝার বর্ণনা ও দৃশ্য শুধু দারিদ্র্যের প্রতীক নয়; এটি রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতারও প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে।

রাজনগর-রসুলপুর গ্রামের সজীব ও রাজিবের গল্প আসলে হাজারো শিশুর গল্প। সকালবেলা যখন দেশের অন্য প্রান্তে শিশুরা শ্রেণিকক্ষে পাঠ নিচ্ছে, তখন তারা মাঠে কাজ করছে। কারণ তাদের গ্রামে কোনো বিদ্যালয় নেই। এই ঘটনার সবচেয়ে বেদনাদায়ক দিক হলো, এখানে বিদ্যালয় নির্মাণের প্রধান বাধা জমির অভাব নয়। স্থানীয় মানুষ ১৯৯৩ সালে বিদ্যালয়ের জন্য ৩৩ শতক জমি দিয়েছেন। পরে আরও দুই দফায় জমি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। বরং বিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া জমির একটি অংশ দখল হয়ে যাওয়ার অভিযোগও উঠেছে। এটি শুধু প্রশাসনিক উদাসীনতার নয়, জবাবদিহির সংকটেরও প্রমাণ।

একটি গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি যখন বলেন, ‘আমি নিজে পড়তে পারিনি, অন্তত নাতিদের কলম ধরাতে চেয়েছিলাম’, তখন সেটি কেবল ব্যক্তিগত আক্ষেপ নয়; এটি কয়েক প্রজন্মের বঞ্চনার ইতিহাস।

নাসিরনগরের পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে। উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৬৫ হাজার শিশুর মধ্যে ১৭ থেকে ১৮ হাজার শিশু কোনো ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয়। এ সংখ্যা নিয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। প্রকৃত সংখ্যা ১৮ হাজার না হয়ে যদি ১০ হাজারও হয়, তাহলেও সেটি ভয়াবহ। কারণ প্রতিটি শিক্ষাবঞ্চিত শিশু একটি হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনা।

শিক্ষাবঞ্চনা কখনও একা আসে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ, অপুষ্টি, অপরাধপ্রবণতা এবং দারিদ্র্যের চক্র। প্রতিবেদনে দেখা যায়, অনেক শিশু কৃষিকাজ করছে, কেউ ঢাকায় গিয়ে হোটеле কাজ করতে প্রস্তুত হচ্ছে। মেয়েশিশুদের একটি বড় অংশ বাল্যবিবাহের ঝুঁকিতে রয়েছে। অর্থাৎ বিদ্যালয় না থাকার মূল্য শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, পুরো সমাজকে দিতে হচ্ছে।

অবশ্য আশার কথাও রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ঝরে পড়া কিছু শিশুকে আবার শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে বাল্যবিবাহ ও শিশুশ্রম রোধেও কাজ হচ্ছে। এসব উদ্যোগ কখনোই সরকারি বিদ্যালয়ের বিকল্প হতে পারে না। একটি অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র শিশুকে প্রাথমিক সহায়তা দিতে পারে, কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্যালয়ই তাকে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষা, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন দিতে পারে।

নাসিরনগরের এই বাস্তবতা আমাদের আরেকটি বিষয়ও মনে করিয়ে দেয়। বাংলাদেশে এখনও শিক্ষাবৈষম্য মূলত ভৌগোলিক বৈষম্য। শহরের একটি শিশু যেখানে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষে পড়ছে, সেখানে হাওরাঞ্চল বা দুর্গম গ্রামের শিশু বিদ্যালয়ের মুখই দেখতে পাচ্ছে না। উন্নয়ন তখনই অর্থবহ হবে, যখন জন্মস্থান কোনো শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না। এখন প্রয়োজন কথার চেয়ে কাজ। বিদ্যালয়ের জন্য দেওয়া জমির আইনগত অবস্থা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। জমি দখল হয়ে থাকলে তা উদ্ধার করতে হবে। বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে। যত দিন স্থায়ী বিদ্যালয় না হচ্ছে, তত দিন অন্তর্বর্তী শিক্ষাকেন্দ্র চালুর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষার বাইরে থাকা প্রতিটি শিশুর একটি হালনাগাদ তথ্যভান্ডার তৈরি করে তাদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

রীমা ইসলাম: সাংবাদিক